দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ২৩-৪-৯৭ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজনীতিতে নারী

মুনিমা মমতাজ

লিপি তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করেছেন রাজনীতিতে। ক্লাসের চেয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনেই তার বিচরণ ছিল বেশী। নিজের রাজনৈতিক দলের প্রতি নতুনদের আস্থা তৈরীর দক্ষতা তাকে ক্যাম্পাসে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। রাজনীতিই ছিল তার ধ্যান ও জ্ঞান। তিনি লেখাপড়া শেষ করে রাজনীতিকেই পেশা হিসাবে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন।

কিন্তু তার এই আশা পূরণ হয়নি। তিনি এখন আর রাজনীতি করেন না।

রাজনীতি করার জন্য তার পরিবার থেকে কোন বাধা আসেনি। বাধা এসেছিল পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে। লিপি তার দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। এর জন্য তিনি সহকর্মীদের বিরূপ মনোভাবকে দায়ী করেন। তার মতে, এই ধ্যান-ধারণা শুধু তার দলের নয়, দেশের সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যেই গেড়ে বসছে।

লিপি বললেন; "পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দলের নেতারা মনে করেন, আমরা মেয়েরা ক্যাম্পাসে রাজনীতির জন্য ভাল। তাদের মতে, জাতীয় রাজনীতির মূলধারা নারীদের জন্য নয়। সুতরাং, তারা আমাদের জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার অনুমতি দেয় না।"

লিপি দলীয় সমর্থক ও নতুন কর্মী তৈরীতে বেশ সফল। তিনি বললেন, "কেন্দ্রীয় কমিটির একটি পদের জন্য যখন মনোয়নের প্রশ্ন আসে, তখন তারা আমার নাম বিবেচনা করতে রাজি হলো না। এর কারণ সহকর্মীদের অনীহা ও আভ্যন্তরীণ দলাদলি। অথচ দেখুন, দলের জন্য আমি অনেকের চেয়েই বেশী কাজ করছি।"

বর্তমানে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। তবে এই অংশগ্রহণ মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ক্যাম্পাস রাজনীতির শতকরা ২৭ ভাগ নারী। অথচ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে নারীদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়।

রাজনীতির মূল অঙ্গনে নারীদের প্রবেশ এখনো প্রশ্নাতীত নয়। এক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় বিবেচনা করা হয়। যেমন এদের কোন পারিবারিক রাজনৈতিক ধারা আছে কি-না? রাজনৈতিক নেতারা এখনও দলীয় কর্মীকে নারী বা পুরুষ হিসাবে বিচার করতে অভ্যস্ত। জাতীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বংশপরম্পরার যে ধারা চলে আসছে, এটা তার একটি প্রধান কারণ।

ইদানীং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একাধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন প্রার্থী জয়ী হওয়ার ফলে কিছু আসন খালি হচ্ছে। সেখান থেকে আবার তাদের পরিবারের সদস্যরাই নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ফলে হতাশ হচ্ছেন অন্যরা। জাতীয় নির্বাচন ও রাজনীতির ধারা থেকে তারা সরে দাঁড়াচ্ছেন। অথচ এরাই হয়তো এলাকার প্রকৃত কর্মী।

জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ছ'জন মহিলা। এদের মধ্যে অধিকাংশই হয় তাদের স্বামীর নির্বাচনী এলাকা অথবা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের ছেড়ে আসা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

বর্তমানে ক্যাম্পাসের যে কোন মিটিং বা মিছিলের সামনে অনেক ছাত্রী দেখা যায়। এতে মনে হতে পারে, নারীরাই বুঝি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মহিলা রাজনৈতিক কর্মী বলেন, "মেয়েদের মিছিলের সামনে শোভা হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুরুষরা আমাদের খুব একটা গুরুত্ব দেন না। তারা ভাবেন, মেয়েদের জন্য ক্যাম্পাস রাজনীতি সময় কাটাবার শখ মাত্র। তবে এই শখও বেশী দিন থাকবে না।"

বাংলাদেশের নারীরা রাজনীতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কেন আসতে পারছে না? এ প্রশ্নের জবাবে একটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির জনৈক সদস্যা বলেন, "কি করে আসবে? যেসব ছাত্রী সাহস করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসতে চায় তাদেরকে নিজ দলের নেতা ও সদস্যরাই কোণঠাসা করে রাখে। শুরু হয় তাদের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি।"

তিনি বললেন, মনোভাব পরিবর্তন হওয়ার দরকার। তা না হলে রাজনীতির মূলধারায় অংশগ্রহণ করা থেকে নারীরা চিরদিন দূরেই থেকে যাবে।

রাজনীতিতে নেতৃত্ব গড়ে তোলার কোন নির্দিষ্ট ছক নেই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখানে নেতা হতে হলে প্রচুর কপটতা ও চাতুর্যের আশ্রয় নেয়া প্রয়োজন। নারীরা সাধারণত সরল আর সৎ প্রকৃতির হন। ফলে তারা এই নোংরা প্রতিযোগিতায় তেমন সফল হতে পারেন না।

লিপি বললেন, ছাত্রীদের দলীয় দায়িত্ব পালনে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। এ কারণে নারীরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারছে না।

তার মতে, বর্তমানে পার্টি নেতাদের তাদের কর্মী ও সমর্থকদের অনেক দাবী পূরণ করতে হয়। তাদেরকে ছাত্রদের জন্য হলে সীট দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে হয়। এ কাজটি মোটেও সহজ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এর জন্য বন্দুকযুদ্ধেও জড়াতে হয়। একজন নেতাকে দলের জন্য চাঁদা তুলতে হয়। নারীর পক্ষে খুব সহজ কাজ নয়।

লিপি আরও বলেন, সমর্থকদের চা-নাস্তা খাওয়ানোর জন্য ব্যাগভর্তি টাকার প্রয়োজন। এ কারণেই ক্যাম্পাসে সক্রিয় ভূমিকা পালন সত্ত্বেও মহিলারা রাজনীতির মূলধারায় অনুপস্থিত। আর এ কারণেই নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধা দেখা দিচ্ছে।

সেন্টার ফর এনালাইসিস এন্ড চয়েস (সিএসি)-এর প্রকল্প পরিচালক তার প্রতিবেদনে নারী প্রার্থীদের নির্বাচনে ব্যর্থতার কতগুলো কারণ তুলে ধরেন। তার মতে, প্রচারের ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞানের অভাবই নারী প্রার্থীদের অসফলতার কারণ। তারা এ কাজের জন্য অসংগঠিত ও অদক্ষ স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর নির্ভর করে থাকেন। এর সাথে রয়েছে আর্থিক সীমাবদ্ধতা।

মহিলা প্রার্থীরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সুযোগ পান কম। সংবাদ মাধ্যমগুলোতে মহিলারা নেতিবাচক না হলেও খুব জোরালোভাবে প্রচার পান না। নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অপরাধী তৎপরতা, কালো টাকার ব্যবহার বড় বাধা হিসাবে কাজ করে।

সিএসি প্রতিবেদনে দেখানো হয় যে, ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল শতকরা শূন্য দশমিক শূন্য তিন (০.০৩) ভাগ। ১৯৯১ সালে তা মাত্র শতকরা ১.৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে স্থানীয় নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ এক দশকে শতকরা ১ ভাগ থেকে ১২ ভাগে উন্নীত হয়েছে। পৌরসভা সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদেও কিছু মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ২৮ জন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু অনেক মহিলা কমিশনার অভিযোগ করেছেন যে, তারা তাদের নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ পাচ্ছেন না।

রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে অল্প সময়ের জন্য মহিলাদের সংগঠিত করে থাকে। কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলাদের অংশগ্রহণ খুব কম। নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়।

গত জাতীয় নির্বাচনে ২ হাজার ৭৮ জন পুরুষ প্রার্থীর বিপরীতে মহিলা প্রার্থী ছিলেন মাত্র ৩৫ জন। নির্বাচিত মহিলা এমপির সংখ্যা মাত্র সাতজন। ১৯৯১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫।

এই বৈষম্যের প্রতিফলন সংসদীয় কমিটির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। দেশের ১২টি সংসদীয় কমিটির মোট ১৩৭ জনের মধ্যে মাত্র আট জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রী তাদের নিজ নিজ দলীয় প্রধান হিসাবে স্থান করে নিয়েছেন।

গত জুলাই মাসে প্রকাশিত সর্বশেষ ইউনিসেফ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সরকারী চাকরিতে নারীদের ইতিবাচক অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকারী চাকরিতে মহিলা আমলার সংখ্যা শতকরা আট ভাগ। সারাবিশ্বে সরকারী উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের গড় হার শতকরা সাত ভাগ।